International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-IV, January 2017, Page No. 1-13
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

বাঙালির ভোজন ও বাছবিচার : সমাজ ও সাহিত্যে

ড.অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, নহাটা, উত্তর চব্বিশ পরগণা

Abstract

Bengalees are very much foody. Also, the tradition of taking different types of food and using different types of utensils in different class people of bengalee society is still going on. The caste oriented discrimination in between Brahmins and Sudras is a serious social problem that also affects their dining togetherly. Bengalee Vaishnabs and Bengalee Muslims are also habituated in their own religious practice and process in taking food that differs with each other. In real life and published works, the contextual believes and social reform of Ishwar Gupta, Swami Vivekananda, Madhusudan Dutta, Rabindranath Tagore and other has been accepted and established distinctly for a new thought.

"প্রায় অপরাহ্নবেলায় ভোজন সমাধা করিয়া রামবাবু তৃপ্তি ও প্রাচুর্যের একটা সশব্দ উদ্গার ছাড়িয়া যখন গাত্রোত্থান করিতে গেলেন, তখন অচলা অনেক কষ্টে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই, যেদিন জানতে পারবেন, আজ আপনার জাত গেছে, সেদিন কিন্তু রাগ করতে পারবেন না, তা বলে দিচ্চি।" বলাই বাহুল্য উদ্ধৃতিটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'গৃহদাহ' উপন্যাসের চৌত্রিশ পরিচ্ছেদের একটি অংশ। অংশটির মধ্যে অন্ততঃ দুটি জিনিস অত্যন্ত লক্ষণীয়। প্রথমটি হলো, রামবাবু এখানে চিরপরিচিত ভোজনবিলাসী বাঙালি চরিত্রের প্রতিভূ আর দ্বিতীয়টি হলো ব্রাহ্মণ অচলার গৃহে অন্নগ্রহণের কথা জানাজানি হলে তাঁর ধর্মনাশের আশংকা। এ দুটি প্রসঙ্গকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলেই আমার আলোচ্য প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্যটি পরিস্কার হবে।

ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে একবার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এক বছরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। দেবীপ্রসাদ সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ হিসেবে তিনি জানান, "পোষাবে না মশাই, দুপুরে এক থাল মাছের ঝোল-ভাত, লেবু, লঙ্কা ডলে খেয়ে কোলবালিশ আঁকড়ে দু'ঘণ্টা না ঘুমালে আমার চলে না।" বাঙালি এতটাই ভোজনপ্রিয়! কবি ঈশ্বর গুপ্তও বলেছিলেন, 'ভাত-মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙ্গালি সকল/ ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল।' কথায় আছে ডালে-ভাতে বাঙালি অথবা মাছে-ভাতে বাঙালি। বাঙালি চিরকালই ভোজনরসিক। তার সাথে খাদ্য-খাবার নিয়ে বাঙালির মধ্যে ও সমগ্র বাংলা জুড়েই ছড়িয়ে আছে কত না ছড়া আর প্রবাদ। 'সর্বঘটে কাঁঠালিকলা', 'ঝোলে-ঝালে-অম্বলে', 'আদায়-কাঁচকলায়', 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল', 'ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই ভোজন ছত্রিশ জাতে', 'মাছের তেলে মাছ ভাজা', 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা', 'বুনো ওল বাঘা তেঁতুল' এমন অজস্র নমুনা আছে তার। বাঙালির 'মাছে-ভাতে উৎপাত'-এর শুরু কবে, তা সঠিক বলা মুশকিল। তবে দশ কি এগারো শতকে বাংলার অন্যতম প্রধান স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট ছুটে এসেছিলেন বাঙালির, বিশেষ করে বাঙালি ব্রাহ্মণের মাছের থালা বাঁচাতে। আসরে নেমে ভবদেব ভুলেও শাক দিয়ে মাছ ঢাকার পথে হাঁটেন নি। তিনি লোকাচার তথা দেশাচারের মোক্ষম যুক্তি দিয়ে বাঘা বাঘা অবাঙালি স্মৃতিকারের মুখ বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন। বাঙালির মাছ খাওয়ার

সপক্ষে তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল— বাংলার মাটি, বাংলার জল—বাঙালিকে যে খাদ্য সরবরাহ করে, সেটাই তার স্বাভাবিক আহার্য। এমন আহার্য গ্রহণই তার স্বাভাবিক ধর্ম। উল্লেখ্য, ভবদেব সেসময় শুধু সাধারণ বাঙালিরই নয়, বরং ব্রাহ্মণেরও মৎস্যাহারকে সমর্থন করেছিলেন। একসময় বিবেকানন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় উনিশ শতকীয় বাঙালির ভোজনবিষয়ক নানা খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরেছিলেন। বাঙালির ভোজনের সাথে আর একটি সংস্কারও দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি সমাজে প্রচলিত আর তা হলো ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার। শুধু খেলেই তো হবে না, কিভাবে খাবেন, কোন্ পাত্রে খাবেন, কিভাবে পরিবেশন করবেন—কতরকম বাছবিচার। এমনিতেই বাঙালীর শরীরে ছত্রিশ জাতের রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বাঙালীর রান্নার রকম-সকমও এক নয়। কখনও কখনও খাঁটি বাঙালী খানা ইসলামী সংস্কৃতির মিশ্রণে হয়ে গেছে বাদশাহী খানা। আবার কখনও হায়দরাবাদী বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের খানা দিব্যি উঠে গেছে বাঙালীর হেঁসেল হয়ে পাতে। উল্টোটাও ঘটেছে। বাঙালীর মধ্যেই তো ঘটি-বাঙাল, হিন্দু-মুসলমান, শাক্ত-বৈষ্ণব, দিশি-বিলিতি, সাহেব-বিবি-গোলাম—কতরকমের বিভাজন! নানা গোষ্ঠীর নানা রকম আসন, নানা রকম বাসন, তৈজস, রান্নার নানা ধরনের তরিকৎ। মোগল-আফগান-তুর্কী-পাঠান থেকে শুরু করেন ইংরেজ বাদশা—নানা শাসক আর নানা ঘাটের জল খেয়ে জল খেয়ে বাঙালীর বেঁচে থাকা, এগিয়ে চলা। জাত-পাত নিয়ে ছুৎমার্গ বাঙালি সমাজে আগে থেকেই ছিল, কিন্তু সমাজের বুকে কখনও কখনও সেটি প্রকট হয়ে পড়তো পংক্তিভোজনে। একসময় সংস্কৃত তর্কবাগীশরা পংক্তিভোজনের ক্ষেত্রে 'আশ্রয় দোষ'-এর কথা বলতেন। স্পর্শদোষের মতোই ছিল এই 'আশ্রয় দোষ'। বর্ণাশ্রমের কুফল হিসাবেই যেন খাবার আসনে এই ছোঁয়াছুঁয়ির বালাইকে বর্ণহিন্দু সমাজ তথা উঁচুজাতের লোকেরা অতি সযতনে রক্ষা করে চলতেন। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যের দিকে তাকালে এই তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল বাছবিচারের ছবিটি ভাঙার প্রচেষ্টাও দেখতে পাই। 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থ থেকে জানা যায় নদের নিমাই-এর নগর ও বাজার পরিক্রমার কথা। নবদ্বীপে সে সময় ভিন্ন ভিন্ন জাতির আলয় ছিল ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায়। নিমাই ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও জাতি-বিচার করতেন না। আর তাই বিনা নিমন্ত্রণে নিত্যানন্দকে সাথে করে একবার তিনি হাজির হয়েছিলেন গোপ পাড়ায়। তারপর স্বয়ং নিমাই তাদের সাথে এক পংক্তিতে একসাথে বসে দধি-দুগ্ধ সহ ভোজন করে যেমন রসনা পরিতৃপ্ত করেছিলেন তেমনই এক লহমায় যাবতীয় সামাজিক সংস্কার ও জাতিভেদকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এ সংক্রান্ত আর এক করুণাঘন কাহিনীর বিবরণও পাওয়া যায় মহাশ্বেতা দেবীর 'বান' গল্পে। এ গল্পের কাহিনীটি ১৫১৩ সালের। গল্পে আছে নিমাই সন্ন্যাসী যখন মাতাকে দর্শন করে নীলাচলে ফিরছেন তখন কাটোয়ার পূর্বস্থলীর বিত্তশালী পোতদার আচার্য ঠিক করলেন রান্নাপূজার আয়োজন করবেন। নিমাই-য়ের গমন পথে পড়ে আচার্যের গ্রাম। আচার্য চেয়েছিলেন একদিনের জন্য ইতর-ভদ্রজনের পংক্তিভোজন করিয়ে, ব্রাহ্মণ-চাঁড়াল-বাগদীকে একসঙ্গে খাইয়ে তিনি নিমাইকে সন্তুষ্ট করবেন আর একইসঙ্গে নিজের নাম-ডাকও বাড়াবেন। কারণ- 'গৌরাঙ সন্ন্যাসী নাকি উঁচুকে নীচু আর নীচুকে উঁচু করবে বলে লেচে বেড়াচ্ছে।' আচার্যের এই সিদ্ধান্তে সব থেকে আশান্বিত হয়েছিল গ্রামের রূপসী বাগদীনির ছেলে চিনিবাস বাগদী। তার আশা ছিল আচার্যের আয়োজনে একদিনের জন্য হলেও তার বাড়ির দাওয়ায় বসে ভাত খাওয়ার সুযোগ মিলবে। কিন্তু চিনিবাসের স্বপ্ন সফল হলো না। নিমাই ঠাকুর পূর্বস্থলী না এসে শান্তিপুর-কাটোয়া হয়ে কুমারহট্টের পথ ধরলেন। চিনিবাসেরও আর আচার্য বাড়িতে বসে গরম ভাত খাওয়া হলো না। পংক্তিভোজনের দিন আচার্য তাদের সবাইকে দাওয়া থেকে নামিয়ে দিলেন। গল্পটির মধ্যে দিয়ে একদিকে হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও অন্যদিকে পতিত উদ্ধারের নামে উচ্চবিত্তের ভড়ং সর্বস্ব বাহ্যিক আয়োজন ও আড়ম্বড়ের করুণাঘন পরিণামী ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

বৈষ্ণবীয় গুরুবাদে বলা হয় দীক্ষা না নিলে মানুষ পবিত্র হয় না, তাই পূজা-পার্বন, জপ, তপ, ব্রত ইত্যাদি যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার অধিকারও জন্মায় না। কেননা, অদীক্ষিত বৈষ্ণব অপবিত্র থাকে। অপবিত্র মানুষের পূজা দেবতারা গ্রহণ করেন না, আর সে পূজায় কোনো ফল লাভও হয় না। বৈষ্ণব গুরু শ্রীচরণ দাস ঠাকুর শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিয়ে দীক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে লিখেছেনঃ

অদীক্ষিতাং লোকানাং দোষং শৃণু বরাননে।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্।
যং কৃতং তস্য শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতিহ্যধোগতিম্।১ (তথাহি মৎস্য সূক্তে)

অর্থাৎ অদীক্ষিত ব্যষ্টির অন্ন বিষ্ঠার সমান, জল মূত্রতূল্য। তাহারা শ্রাদ্ধাদি যাহা কিছু করে তাহা সমস্তই বৃথা। অন্যদিকে যাঁদের নিরন্তর চেষ্টার ফলে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' একটি বিশিষ্ট ধর্মীয় মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় বৃন্দাবনের সেই ছয় চৈতন্য অনুগত ভক্তপার্ষৎ গোস্বামী রূপে আজও বিখ্যাত। এঁরা হলেন সনাতন গোস্বামী, তাঁর ভাই রূপ গোস্বামী, তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী। এই গোস্বামীদের মধ্যে প্রথম পাঁচজন ছিলেন ব্রাহ্মণ আর একমাত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন শূদ্র। এই গোস্বামীদের মধ্যে গোপাল ভট্ট ছিলেন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ; তিনি কখনও বাংলায় এসেছিলেন কি না তা জানা যায় না। সম্ভবত সনাতন গোস্বামীর সাহচর্যে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতিশাস্ত্র 'শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস' রচনা করেন। এই 'শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্মের কর্মকাণ্ড ও তাদের আচরণবিধি নির্দিষ্ট ছিল। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গুরুর বিশেষ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিধান দেওয়া হয় যে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবেরা শূদ্র-বৈষ্ণবদের অন্ন গ্রহণ করতে পারবেন না। ব্রাহ্মণকে দান আসলে ভগবান বিষ্ণুকেই দান। তাই ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে উপাদেয় ভোজন দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করে দিতে হবে আর তাঁরা স্বহস্তে, স্বপাকে রান্না করে তার সেবা গ্রহণ করবেন। পৌরাণিক ব্রাহ্মন্যবাদ অন্ত্যজ শূদ্রকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করেছিল, কিন্তু এই গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদে চণ্ডালদের দর্শন করলেও উচ্চবর্ণের বৈষ্ণবদের মহাপাপ হতো, আর তাঁরা সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকে যাতে সেই চণ্ডাল দর্শনজাত মহাপাপ স্খালন করতে পারেন তার বিধানও বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছিল। এ সকল বিধান ও আচরণবিধিগুলি হিন্দু ধর্মের বাছবিচারকে ক্রমশঃ আরো জটিল করেছে।

মুসলমান সমাজেও এ সম্পর্কিত নানা জটিলতা আছে। মুসলমান সমাজ পালিত কুর-আন-শরীফের সুরা আল আন-আমের ১১৮ ও ১১৯ নং আয়াতে বলা হয়, আল্লাহ বলেছেন, '*অত: পর যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ কর যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। কোন কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ্ ঐ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন; কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্যে হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারীদেরকে যথার্থই জানেন।* (*৬: ১১৮-১১৯*)' অর্থাৎ, আল্লাহর নামে জবাই করা জন্তু খাওয়া হালাল। আবার আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেও যেসব জন্তু খাওয়া হারাম (যেমন, শুকর) তা হালাল করা যাবে না। কিন্তু নিরুপায় হয়ে খেতে হলে তাও (যেমন, শুকরের মাংস) হালাল হয়ে যাবে। এ কারণে হারাম ও হালাল সম্পর্কিত এক ধরনের বিভ্রান্তিও কখনও কখনও মুসলমান সমাজে তৈরী হয়। মাংসের ক্ষেত্রে এমন ব্যাপার থাকলেও মাছের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি নেই। মাছ বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সকলেরই প্রিয়। শোনা যায়, মাছ নিয়ে মোগল সম্রাটদের মনেও কোনোরূপ সংস্কার ছিল না। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তো রুই মাছ বেজায় পছন্দ করতেন। তিনি তার আত্মজীবনী 'তুজুক'-এ লিখে গেছেন যে, মালব থেকে গুজরাটে যেতে পথে সর্দার রায়সান তাকে একটা বড় রুই মাছ দেন। বহুদিন পর একটি ভালো রুই পেয়ে বাদশা এত খুশি হন যে, তখনই তিনি সর্দারকে একটি উৎকৃষ্ট ঘোড়া উপহার দেন।

প্রাচীন ভারতে গোমাংস খাওয়ার বহুল প্রচলন ছিল। আর্কিওলজিস্টরা ভারতবর্ষের মাটি খুঁড়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার বছরের পুরোনো বিভিন্ন প্রাণীর প্রচুর হাড়গোড় পেয়েছেন। তার মধ্যে খুব বেশী পাওয়া যায় কাটা ও পোড়ানো গরুর হাড়। এ থেকে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন ভারতে গোমাংস কেটে ও আগুনে ঝলসিয়ে তা খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র 'চরকসংহিতা'য় (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতক) গরু, মহিষ বা শুয়োরের মাংস প্রতিদিন খাওয়া অনুচিত বলা হয়। কিন্তু সেখানে ভ্রুণ শক্তিশালী করার জন্য গর্ভবতী মায়েদের

গোমাংস খাওয়ার উপদেশও দেওয়া হয়। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের মূল্যবান আকরগ্রন্থ 'কৃষ্ণযর্জুবেদ ব্রাহ্মণ'-এ এমন অসংখ্য অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে যেগুলোতে গরুর মাংসের প্রয়োজন হতো। এমনকি কোনো কোনো দেবতার তুষ্টির জন্য কী ধরনের গরু বলি দিতে হবে, তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সেখানে আছে। রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ—এসব বড় বড় যজ্ঞে গো-হত্যা ছিল অপরিহার্য। আল-বেরুণী পারস্য থেকে ভারতে এসে, সংস্কৃত শিখে, ভারতবর্ষ নিয়ে লিখেছিলেন তাঁর 'তারিখ-আল-হিন্দ' বইটি। সেই বইয়ের আটষট্টি অধ্যায়ে তিনি হিন্দুদের কাছে কোন মাংস খাদ্য হিসেবে গণ্য ও কোনটা অখাদ্য তার একটা তালিকা দিয়েছেন। তাতে গরু আছে হিন্দুদের অখাদ্যের তালিকায়। আলবেরুণী লিখেছেন যে সেকালে শূদ্ররা গোমাংস খেত। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার তাঁর Early India বইটির এক জায়গায় লিখেছেন যে গোমাংস খাওয়ার নিষেধ উঁচু জাতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই গোমাংস খাবার নিষেধাজ্ঞা স্মৃতিসাহিত্যে থাকলেও ব্যাপারটা সমাজের সবক্ষেত্রে বলবৎ ছিল না। একসময় বৌদ্ধধর্ম প্রাণীবধ থেকে বহু পশুকে মুক্তি দিয়েছিল। সারা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও অহিংসার জন্য সে সময় প্রচুর মানুষ মাংস খাওয়া থেকে বিরত ছিল। এটাও ছিল গোমাংসের প্রচলন কমে যাওয়ার একটা অন্যতম কারণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ ও মনুস্মৃতিতে 'পিষ্টপশু' অর্থাৎ চাল ও যব দিয়ে তৈরী পশুর মূর্তি বলি দেওয়ার কথা লেখা আছে। যজ্ঞে পশুবলি কমে গেলে তার সাথে গোমাংস খাওয়াও কমে আসাই স্বাভাবিক, যদিও এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এছাড়া, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালির প্রধান খাদ্য বর্তমান সময়ের মত তখনও ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি। চাউল থেকে প্রস্তুত নানা প্রকার পিঠাও জনপ্রিয় ও মুখরোচক খাবার ছিল। বাঙ্গালি ব্রাহ্মণেরা আমিষ খেতেন। তখন সকল প্রকার মাছও পাওয়া যেত। পূর্ববঙ্গে ইলিশ ও শুঁটকি মাছ খুব প্রিয় খাবার ছিল। তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, কাঁকরোল, কচু উৎপন্ন হতো। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু পাওয়া যেত। তবে ডালের কথা কোথাও বলা নেই। দুধ, নারকেলের জল, ইক্ষুরস, তালরস ছাড়া মদ জাতীয় নানা প্রকার পানীয়ও সুপ্রচলিত ছিল। ভাত, গম, ইক্ষু, গুড়, মধু ও তালরস গাঁজিয়ে নানা প্রকার মদ তৈরি করা হতো। নানা অনুষ্ঠানে মদ জাতীয় নানা প্রকারের পানীয় পানও করা হতো। খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতিও ছিল। কবিকঙ্কণের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর ভোজন বর্ণনায় অন্ত্যজ বাঙালীর (ব্যাধ) খাদ্য বর্ণনা যেমন পাওয়া যায় তেমনি কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনের পর আহারে-বিহারে তার অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটুকুও চোখে পড়ে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলোতে পঞ্চব্যঞ্জন, দক্ষিণব্যঞ্জন, পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনের কথা বলা হয়েছে। চাঁদ-সওদাগরের পত্নী সনকার রান্না করা 'পঞ্চাশ ব্যঞ্জন'-এ মধ্যযুগের সওদাগরদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে মাংস অপেক্ষা মাছের ব্যঞ্জনই বেশি। সঙ্গে আছে বিভিন্ন শাক-সবজির তরকারি। গরিব জনসাধারণের জন্য শাক-সবজি বা বড়জোর মাছই ছিল প্রধান খাদ্য। পনেরো, ষোল ও আঠারো শতকের তিনটি কাব্যগ্রন্থে [চণ্ডীমঙ্গল (১৫৫১), পদ্মপুরাণ (১৪৯৪) ও অন্নদামঙ্গল (১৭০২)] দেওয়া ব্যঞ্জন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অভিজাত পরিবারের মতো গৃহস্থ পরিবারে ব্যঞ্জনের এত বৈচিত্র্য ছিল না, তবে আমিষ ও নিরামিষ জাতীয় অনেক ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে কিছু মিল ছিল। দেশজ শাক, সবজি, ফলমূল ও নিরামিষ ব্যঞ্জনই ছিল সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক খাবার। মুসলমানদের বিবাহ, আকিকা, ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গরু কিংবা ছাগল জবাই করা হতো। অবস্থাসম্পন্ন মুসলমান আকিকা কিংবা কোরবানির মাংস গরিব ও আত্মীয়দের মধ্যে বিলি করতেন। 'মনসামঙ্গল'-কার বিজয় গুপ্ত ছিলেন বরিশালের মানুষ— তাঁর রান্নায় পূর্ব বাংলার মধ্যযুগের রান্নার একটা ছবি পাওয়া যাবে, যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিজয়গুপ্তের বর্ণনায়ঃ

'মৎস্য কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে নলতার আগ
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছা।
ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুন মাছ

ভিতরে মরিচ গুঁড়ো বাহিরে জুড়ায় সুতা।
তৈলে পাক করিয়া রান্ধে চিংড়ির মাথা
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল '

তালিকাটি মূলতঃ সেকালের হিন্দুবাড়ির রান্না— পেঁয়াজ, রসুন ও অন্যান্য অনুষঙ্গ ধরলে মুসলিমবাড়ির দৈনন্দিন রান্নার সঙ্গে যার খুব একটা তফাত নেই। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গেও অনেকটা এভাবেই রান্না করা হয়।একটা সময় মুসলিমদের 'নেড়ে' বলা হতো আর তাদের যে 'প্যাঁজ' অর্থাৎ পেঁয়াজ প্রিয় ছিল তাও জানা যায় মধুসূদনের প্রহসন থেকেই ('বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' দ্রষ্টব্য) । তবে পেঁয়াজ,রসুন আজ আর অচ্ছুৎ নয়। এখন ব্রাহ্মণ বাড়িতেও রান্না মুরগীর পাশাপাশি পেঁয়াজ,রসুন অক্লেশে জায়গা করে নিয়েছে।

বেদান্তপন্থী রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় কুসংস্কার ছিল না। তাঁর যেমন সংস্কার ছিলনা আহার্য বিচারে তেমনই আহার্য সম্পর্কিত যাবতীয় সামাজিক ভ্রান্ত ধারণারও ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। রামমোহন প্রতিদিন প্রায় বারো সের দুধ পান করতেন। শোনা যায় একবারে তিনি একটি আস্ত পাঠার মাংসও খেতে পারতেন। ১৮১৪ সালে রামমোহন কলকাতায় আসেন ও হিন্দুধর্ম সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতায় তাঁর ষোল বছরের সংগ্রাম ও সংস্কারকে রাজা রামমোহনের জীবনের অন্যতম কর্মযুগ বলা যেতে পারে। নবজাগরণের অগ্রদূত রামমোহন সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে হাতে তুলে নেন রণ-শৃঙ্গ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই গোঁড়া হিন্দু সমাজে তাঁর অনেক শত্রুর সৃষ্টি হয়। একবার তিনি মধু দিয়ে রুটি খেতে খেতে বালক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেছিলেনঃ 'বেরাদর (পারস্য শব্দে অর্থ 'ভাই'), আমি মধু ও রুটি খাচ্ছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গরুর মাংস ভোজন করে থাকি।' সামাজিক কুৎসা, জীবনের উপর আক্রমণ একসময় সবকিছুই নিদারুণ ভাবে সইতে হয়েছে তাঁকে। সমাজের মানুষের পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেও তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদের বিয়ের সময় তার বিরুদ্ধ-দল সেই বিয়ে ভাঙারও প্রভূত চেষ্টা করে। এমনকি রামমোহনকে একঘরে করে রাখার আয়োজনও করা হয়। যদিও এ কাজে তারা সম্পূর্ণতঃই ব্যর্থ হয়েছিল। কখনও কখনও এই কুচক্রীরা মুরগির ডাক ডাকা থেকে শুরু করে তাঁর গৃহাভ্যন্তরে গরুর হাড় পর্যন্ত ফেলে দিয়ে যেত। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে কুরুচিকর গানও রচনা করে সমাজের ঐ সকল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গ। সে গানের ভাষা ছিল এমনঃ

'সুরাই মেলের কুল
(বেটার) বাড়ি খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল।
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা
বানিয়েছে ইস্কুল।
ও সে জেতের দফা
করলে রফা, মজালে তিন কুল।।'

প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের এতো অত্যাচার সহ্য করার পরও রামমোহনের কোন লেখায় কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ ফুটে ওঠেনি। কারণ তিনি ছিলেন খুবই ধৈর্য্যশীল ও প্রগতিপন্থী একজন মানুষ।

এবারে উনবিংশ শতকে আসা যাক। সারদানন্দের লেখা 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটির পাঠকেরা জানেন যে একসময় রাণী রাসমণির দেওয়া অন্নগ্রহনেও আপত্তি ছিল রামকৃষ্ণদেবের। পরে তা চলে যায়। আর মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় জানা যায় আরো বেশকিছু তথ্য। উনবিংশ শতকে নানা শ্রেণি আর বর্ণে ভরা কলকাতার মানুষেরাও জাত যাবার ভয়ে একে অপরের সাথে একসঙ্গে বসে খেতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে শিমলে পাড়ার

পরমহংস মহাশয়ের (রামকৃষ্ণ পরমহংস) রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে যাতায়াতের পর থেকেই নাকি অবস্থা বদলাতে শুরু করে। দক্ষিণেশ্বরের পূজারী পরমহংস মশাই প্রায়শঃই আসতেন রামচন্দ্রের বাড়িতে। প্রথম প্রথম কলকাত্তাইয়া বাবুরা ভেবেছিলেন তাকে নিয়ে তারা রসিকতা আর আমোদ করবেন, কিন্তু কয়েকবার আসা-যাওয়ার সুবাদে তাঁর প্রতি কারোও আর তেমন অবজ্ঞার ভাব রইল না। বরং পরমহংস মশাই দত্ত বাড়িতে এলেই দত্তবাড়ির ছাদে বসতে লাগল খাওয়া-দাওয়ার মস্ত আসর। বিনা নেমন্তন্নে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, মেয়ে-পুরুষ সমেত নানা জাতের লোকেরা সেখানে পরিতৃপ্তি সহকারে লুচি-তরকারি খেতেন। উনিশ শতকের আশির দশকে তা যেমন সংস্কারের আগল ভেঙ্গেছিল তেমনই বাঙালীর খাওয়া-দাওয়ার বিচারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে তা ছিল এক অবাক করার মতোই ঘটনা। এ প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের অনুধ্যান' গ্রন্থটিও ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক প্রশংসার দাবী রাখে।

ঈশ্বর গুপ্ত সাহেব-মেমদের খাদ্যপ্রীতি ও মদ্যাসক্তি নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। বিবেকানন্দও এককালে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পছন্দ করতেন। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় আরো যা জানা যায় তা হলো, কলকাতার অভিজাত সাহেব পাড়ায় যখন অভিজাত সাহেবরা ইংরাজী নববর্ষের অনুষ্ঠান পালন করতেন তখন সেখানে ভারতীয় তথা বাঙালীদের প্রবেশাধিকার থাকতো না। অর্থাৎ এখনকার ইংরাজী বর্ষশেষের বা বর্ষশুরুর পার্কস্ট্রীটের রাত তখন ছিল এক অবাস্তব ও অসম্ভব কল্পনার বিষয়। বাঙালিরা চিরকালই ছিল পৌষ-উৎসব বা পিঠে-পুলিতে অভ্যস্ত। চপ-কাটলেট, কেক-ওমলেট-এর মতো সাহেবী খানা তখন বাঙালীদের কাছে স্বপ্নই ছিল। সাহেবী হোটেলে যাওয়া কিম্বা কন্টিনেন্টাল ফুড হ্যাবিটে অভ্যস্ত হওয়া বাঙালীদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। অবশ্য পূর্ববঙ্গে যেসব ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্মসূত্রে নানা জেলা শহরে কাটিয়েছেন, বাঙালিদের মতো মাছই ছিল তাদের প্রধান ভোজ্য। 'ফিশ অ্যান্ড চিপস' খাওয়া সেই সব সাহেবরা বাঙালীর প্রিয় মাছকেই তখন নিরাপদ ও সুলভ খাদ্য হিসেবে দেখেছেন। শুধু রাতে বা দুপুরে নয়। পূর্ববঙ্গের মফস্বলে কর্মরত সাহেবরা সকালের নাস্তাতেও প্রচুর মাছ খেতেন। ঈশ্বর গুপ্তও তো সাহেবদের এই মৎসভোজন সম্পর্কে রসিকতা করে বলেছেনঃ 'ডিস ভরে কিস লয় মিসি বাবা যত/পিস করে মুখে দিয়ে কিস খায় কত।' অন্যদিকে মধুসূদনের মতো নেটিভ যখন ইংরেজী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন, তখন বাঙালী সমাজে রে-রে রব উঠেছিল। কিন্তু তাই বলে মধুসূদনের বিদেশ যাত্রা কিম্বা মাংস অথবা মদ্যাসক্তিতে কোনো ভাঁটা পড়েনি। একথা সত্য যে, বিলাতি মদ্য পান উনিশ শতকীয় শিক্ষিত বাঙালী এবং সাহেবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। টু-পাইস হোটেলের কনসেপশন্ আরো পরে এসেছে। টু-পাইস হোটেলে শহুরে গরীব-গুর্বো মানুষেরা খাওয়া-দাওয়া করতেন। উনবিংশ শতকের কলকাতা শহরে এখনকার ব্যাঙের ছাতার মতো ফুড স্টল বা চটজলদি খাবারের দোকান তখন গজিয়ে ওঠে নি। সেখান বড়জোর মারোয়ারী দোকানের সরবৎ অথবা দেশী ময়রার দোকানে ছানায় প্রস্তুত চিনি ও গুড়ের মিষ্টি পাওয়া যেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে কাজে-কম্মে আসা হেটো মানুষেরা কোঁচড়ে করে মুড়কি-সন্দেশ, মুড়ি-বাতাসা বা খই-কদমা সঙ্গে নিয়ে আসতেন। কখনও জনবহুল স্টেশনের পাশে, কখনও রাস্তার মোড়ে বা গড়ের মাঠের নিরিবিলি ছায়ায় বসে মধ্যাহ্ন ভোজন সারতেন তারা।

ইংরেজদের সাথে খাবার খেয়ে অতীতে **জাত** নষ্ট করে সামাজিক বদনামের ভাগীদার তো অনেকেই হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে আপাদমস্তক সাহেবী কেতাদুরস্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন অন্যতম। ইংরেজদের মতোই মাংস ও মদ্যপ্রীতি ছিল তাঁর। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ, খ্রীষ্টান নারী বিবাহ, কালাপানি পার হয়ে মান্দ্রাজে গমন, মাংস ও মদ্যপ্রীতি প্রভৃতি অনাচারের কারণে পিতা জানকীনাথেরও বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। তবে উনিশ শতকে মধুসূদনের ন্যায় যে সকল কৃতবিদ্য বাঙালীরা বিলাত গমন করেছিলেন সে দেশের সাহেবরা তাঁদের সহিত মেলামেশা কিম্বা পান-ভোজনে কোনো ছুঁৎমার্গ রাখতেন না। হিন্দুধর্মে মাংস ভক্ষণ স্বীকৃত হলেও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাংলায় নিরামিষ **ভোজনকেই** অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। যদিও আহারের ব্যাপারেও দক্ষিণ

ভারতের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কাশ্মীর ও বাংলার ব্রাহ্মণদের আজ আর কোনো মিল নেই। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণরা নিরামিষাশী এবং কাশ্মীর ও বাংলার ব্রাহ্মণরা আমিষাশি। আবার আহারের ব্যাপারে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণদের সাথে গুজরাটী, মাড়োয়ারীবেনিয় ,া এবং জৈন প্রভৃতি অব্রাহ্মণদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। অসবর্ণ ভোজন এবং অসবর্ণ বিবাহও একসময় হিন্দুদের পবিত্র ধর্মমত ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটি পড়লে জানা যায় বিবেকানন্দও খুবই খাদ্য রসিক ছিলেন। বিদেশে থাকাকালীন খাদ্য-খাদাদির বিষয়ে তিনি খুব বেশি নিয়ম মানতেন না। ছোটোবেলায় নরেন্দ্রনাথ নানা জাতের আলাদা হুঁকোয় মুখ দিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন জাত কীভাবে যায়! সেই বিবেকানন্দ দেশি-বিদেশী আহারে যে সংকীর্ণতা দেখাবেন না তা বলাই বাহুল্য। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মাংস খাওয়া উচিত কি না? স্বামীজী তার উত্তরে বলেছিলেন, 'খুব খাবি বাবা! তাতে যা পাপ হবে তা আমার।' শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বিবেকানন্দ বাঙাল বলতেন। বাঙালরা স্বভাবতঃই খাদ্যপ্রিয় হন, শরচ্চন্দ্রও তেমনটি ছিলেন। শরৎচন্দ্রের আর এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী জানান যে, ওদেশে গিয়ে তিনি সাহেবদের মতোই আমিষ খাবার-দাবার খেতেন। এ বিষয়ে গান্ধীর সাথেও বিবেকানন্দের এক স্পষ্ট পার্থক্য আছে। বিদেশের খাদ্যরীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বামিজী জানান, "এ সকল দেশেই ডিনারটা প্রধান খাদ্য। ধনী হলে তার ফরাসী রাঁধুনী এবং ফরাসী চাল।....থাল বদলাবার সঙ্গে কাঁটা চামচ সব বদলাচ্ছে।" বিবেকানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী, সেখানকার খাদ্য তালিকায় ছিল প্রথমে নোনা মাছ বা মাছের ডিম—তারপর একটা ফল। কখনও মাংসের একটা তরকারি ও কাঁচা সবজি দেওয়া হতো। কখনও আরণ্য মাংস, মৃগ-পক্ষ্যাদি, তারপর মিষ্টান্ন ও শেষে কুলফি জাতীয় আহার্য সহযোগে মধুরেণ সমাপয়েৎ করা হতো। বিবেকানন্দ সাহেবদের দেশে গিয়ে ওদের খাওয়া-দাওয়া যেমন রপ্ত করেছিলেন তেমনই রপ্ত করেছিলেন ভোজনপর্বের সাহেবী কেতা-কায়দাও। সাহেবদের সঙ্গে খাবার টেবিলে একাসনে বসে খাওয়ার আদব-কায়দায় ভুল করলে যে সাহেবরা ঠাট্টা করতে ছাড়বে না আর নেটিভদের বাঁকা চোখে দেখবে একথা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। সাহেবদের কাছে অবশ্য জাত-পাতের থেকেও এইসব আনুষ্ঠানিকতাগুলি বেশী গুরুত্বপর্ণ ছিল। বিবেকানন্দ সাহেবদের এই কেতা রপ্ত করার বিষয়ে তাদের শুধু টেক্কাই দেন নি, পাশাপাশি দাদা মহেন্দ্রনাথ বিলেতে গেলে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে কাঁটা-চামচ ধরা থেকে শুরু করে সকল টেবিল ম্যানার্স শেখান। শঙ্করীপ্রসাদ বসু-র 'সহাস্য বিবেকানন্দ' বইতে আছে আর একটি ঘটনার কথা। একবার এক গোমাতা রক্ষাকারী সমিতি তৈরি হয়েছিল। তারা বিবেকানন্দের কাছে এসেছিলেন এ বিষয়ে তাঁর সমর্থন লাভের আশায়। স্বামীজী সব শুনে নাকি বলেছিলেন যে, মানবমাতাদের রক্ষা করার নাম নেই, গো-মাতাদের নিয়ে যত মাথা ব্যথা। এ থেকেই বোঝা যায় মতের দিক দিয়ে বিবেকানন্দ যেমন স্পষ্টবাদী ছিলেন তেমনই খাদ্য-খাদ্যাদি বিষয়ে সকল ভন্ড সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর মন। অন্যদিকে রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্রাবলীর একটি পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ লেখেনঃ "আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুঁৎমার্গ, খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু-হাজার বৎসর খালি বিচার করছে—ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে, ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাম দিক থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে?" স্পষ্টতঃই এই কথাগুলির মাধ্যমে বিবেকানন্দ তোতাপাখির মতো শাস্ত্রবিদ্যা মুখস্থকারী সেইসব পন্ডিতদের তথাকথিত আচার ও আচরণবিধির মূলে আঘাত করতে চেয়েছেন।

বিবেকানন্দ স্বদেশে ও বিদেশে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে যতটা বিদেশিয়ানাকে গ্রহণ করেছিলেন নিরামিষাশী গান্ধিজী ঠিক ততটাই দেশজ ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধিজীর নিরামিষ চাল ও মদ্যপান বিরোধী জীবন-যাপনই তাঁর গাঁধিগিরির অন্যতম লক্ষণ ছিল। তবে বিদ্বান যে সর্বত্রই পূজিত হন বিবেকানন্দ ও গান্ধী—উভয়ের জীবনাদর্শই তার প্রমাণ। খাদ্যাভ্যাস রীতির কোনো প্রভাবই তাঁদের জীবনাদর্শে কোনো ছাপ ফেলে নি। শুধু তাই নয়, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের একটি লেখা থেকে জানা যায়, একবার গান্ধীর আহমেদাবাদের আশ্রমে অন্ত্যজ পরিবারের সন্তান দুদাভাই ঠাঁই পাওয়ায় মগনলাল আশ্রমের জন্য অনুদান দেওয়া বন্ধ করেন। অনুদান বন্ধ বা কুয়ো

থেকে জল তোলা বন্ধ হলেও গান্ধী কোনো কিছুর সাথেই আপস করেন নি বরং তখন তিনি অন্ত্যজদের পাড়ায় গিয়ে থাকবেন বলে জানান। হরিজনদের সাথে একসঙ্গে ভোজনে বসে গান্ধী তেমনই সমান পরিতৃপ্ত যেমন সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে ভোজনে তৃপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে যে গান্ধী একদা বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন তাঁর আচরণের মধ্যে দিয়ে তিনি যেন তার বিরুদ্ধাচারণ করতেই দেশের অন্ত্যজ কালো মানুষগুলিকে বুক টেনে নিতে চেয়েছেন।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ তথা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা সকলেই ছিলেন 'পীরালী' সম্প্রদায়ের। সাহস করে পীরালি ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করেছিলেন ঠাকুর বংশের কোনো এক পূর্বপুরুষ। ড. গোলাম সাকলায়েনের 'বাংলাদেশের সূফী সাধক' বই থেকে জানা যায়, পয়গ্রাম-কসবায় উৎপত্তি হয় এই প্রখ্যাত 'পীরালী' সম্প্রদায়ের। যশোর অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তার নাম হয় মুহম্মদ তাহের বা পীর আলী মুহম্মদ তাহের। এই পীর আলী এ দেশের বহু অমুসলমান নর-নারীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন বলে পরবর্তীতে তাদেরকে বলা হয় 'পীর আলী' অথবা 'পীরেলী' মুসলমান। সেকালে যে বংশের লোকেরা এমন মুসলমান হত, তাদের হিন্দু আত্মীয়দের মতে তারা সমাজচ্যুত হত। তাদের কখনও পীরালী ব্রাহ্মণ আবার কখনও বা পীরালী কায়স্থ আখ্যায় অভিহিত করা হতো। পীরালী হিন্দু-মুসলমানেরা এভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল এদেশে। পীরালীদের মধ্যে বহু হিন্দু রীতি প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে এক প্রচলিত রীতিকে ঠাট্টা করে বলা হতোঃ 'মোসলমানের গোস্ত-ভাতে/ জাত গেল তোর পথে পথে/ ও-রে ও পীরেলী বামণ।' এ প্রসঙ্গেই 'হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি' গ্রন্থে গোলাম মুরশিদও লেখেন যে, মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে অনেক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু জাত খুইয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। একবার জাত খোয়ানোর পর তাদের কেউ কেউ মুসলমানও হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন পতিত ব্রাহ্মণ বলে যাঁরা পরিচিত হন তাঁরাই ছিলেন পীরালী ব্রাহ্মণ। এমনই এক ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ অধস্তন পুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পীরালী ব্রাহ্মণদের বিষয়ে একটি গল্পও চালু আছে এবং তা হলো, রমজানের সময়ে এই ব্রাহ্মণরা পীর আলীর সামনে বসে খান এবং দাবী করেন যে, তার রোজা নষ্ট হয়েছে। তাঁরা যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, ঘ্রাণে অর্ধভোজন, অতএব তাদের খাবারের গন্ধে পীর আলীর অর্ধেক ভোজন হয়েছে। কিছুদিন পর পীর আলী এই ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করেন। এবারে তিনি তাদের সামনে বসে গোমাংস খান এবং কামদেব ও জয়দেব সমক্ষে দাবী করেন যে, যেহেতু ঘ্রাণে অর্ধভোজন, সুতরাং তাদেরও জাত নষ্ট হয়েছে। এই গল্প সত্য ঐতিহাসিক গল্প কিনা, তা বলা যায় না। কিন্তু এর মধ্যে এক গভীর সত্য লুকিয়ে আছে এবং তা হলো, খাদ্য সংক্রান্ত কিছু তুচ্ছ কারণে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে সেকালে অনেক হিন্দু জাত খুইয়ে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থটিতেও উপরোক্ত ঘটনাটির বিবরণ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় অনেক সময়ই বিদেশে কাটিয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে এমন অনেক বর্ণনাই পাওয়া যায়। এমনই একটি বর্ণনাঃ "সাড়ে আটটার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না, ছ-টার সময় বিছানা থেকে উঠলে এখানকার লোকেরা আশ্চর্য হয়। তারপরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এদেশে যাকে স্নান বলে, আমি সে-রকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি, গরম জল নয়-- এখানকার এই বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। ন-টার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ন-টা আর সেখানকার ছ-টা সমান। আমাদের আর-একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান খাওয়া-- মধ্যাহ্নভোজন। মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে, তার পরে রাত আটটার সময় আর-একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়াজন হয়ে থাকে; এইরকম আমাদের দিনের প্রধান বিভাগগুলি খাওয়া নিয়ে।" [য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, তৃতীয় পত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] ঐ গ্রন্থেরই আর এক স্থানে দেখি কবি বলছেনঃ "এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজির দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান পদে পদে দেখতে পাই কিন্তু বইয়ের দোকান প্রায় দেখতে পাই নে।" [য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, দ্বিতীয় পত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] বলাবাহুল্য বিদেশে খাওয়া-দাওয়ার যে পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তা তাঁকে মানিয়ে নিতে হয়েছিল। এ বিষয়ে কবি কোন বাছবিচার করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া শান্তিনিকেতনে অবশ্য ব্রাহ্মণ ছাত্র অব্রাহ্মণকে প্রণাম করবেন কি না, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে একাসনে বসে খাবেন কি না, অব্রাহ্মণের হাতে ব্রাহ্মণ খাবেন কি না—এ প্রশ্নগুলি উঠতো। এ ছাড়াও আশ্রমিক জীবনে জাতের বাছবিচার বিষয়ক আরো একটি বিবরণ মেলে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রনাথের কথা' গ্রন্থটিতে। হরিচরণের ভাষায়ঃ "একদিন সকলের খাওয়ার পরে শুনিলাম, একটি অস্পৃশ্য জাতির বালকের কোনোপ্রকার সংস্পর্শে অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন দূষিত হইয়াছে।.... .... আমরা দুগ্ধাদি খাইয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া স্বস্থানে আসিলাম।" এ থেকেই বোঝা যায় পীর আলীর গন্ধদোষের ন্যায় খাদ্যের স্পর্শদোষেও জাতের বিচার চলে এবং জাত যায়! আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে অব্রাহ্মণ আচার্যের বসা উচিত কিনা এই নিয়ে বিরোধটিও পাকিয়ে উঠেছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালাদেবীকে লিখেছেনঃ "বৈষ্ণব যেখানে বোষ্টম নয় সেখানে আমিও বৈষ্ণব, খৃষ্টান যেখানে খেষ্টান্ নয় সেখানে আমিও খৃষ্টান।" হেমন্তবালা তাঁর পুজো আচ্চা বিশ্বাস দিয়ে ঘেরা জগৎটির পক্ষ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে এবং অনুপম রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত মনটিকে ধাক্কা দিতে পেরেছিলেন। জমিদারি দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন পদ্মায় পরিভ্রমণ করতেন তখন তাঁর পূর্ববঙ্গের কৃষক-প্রজাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান, এমন কি তাঁর নৌকার মাঝিটিও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছিন্নপত্র'-এর একস্থানে পদ্মাবক্ষের এক নির্জন রাত্রে নিজেকে হারিয়ে ফেলার রোমান্টিক বর্ণনায় বলে ওঠেনঃ "নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণচন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো, মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি—মাঝে মাঝে আমার উন্মেষ এবং পরমূহুর্তেই সুগভীর নৈরাশ্য... ...।" এই 'চলনশীল লণ্ঠন'-টি হলো গফুরের হাতের লণ্ঠন। এরই সঙ্গে অন্য একটি পত্রে স্ত্রী মৃনালিনী দেবীকে কবি লিখছেনঃ "ভিজে বাদলার বাতাস দিয়েছে, সূর্য প্রায় অস্তমিত। ... ... গফুর মিঞা নৌকোর পিছন দিকে একটি ছোট্ট উনুন জ্বালিয়ে কী একটা রন্ধনকার্যে নিযুক্ত আছে। মাঝে মাঝে ঘিয়ে ভাজার চিড়বিড় শব্দ হচ্ছে এবং নাসারন্ধ্রে একটা সুস্বাদু গন্ধও আসছে।" এ বিবরণ থেকেও বোঝা যায়, কবির অসাম্প্রদায়িক মনের অভিব্যক্তি। তাঁর 'লোকহিত' সহ অনেক প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ সামাজিক লোকাচার সহ নানা ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান জাতি বিরুদ্ধতার বিপক্ষে সওয়াল করেছেন। তবে রবীন্দ্র শ্রীক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে নিয়মের বাছবিচার থাকলেও তাঁর রচনার সব ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি এই সাম্যবাদী নিয়মগুলিকে একইরকম ভাবে বজায় রাখতে পারেন নি। তাঁর 'অচলায়তন' নাটকে দেখি পঞ্চক আবাসিক বিদ্যালয়ের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে চলে যায়। ব্রাত্যদের পাড়ায় গিয়ে খাদ্যগ্রহণেও তার আপত্তি নেই। 'গোরা' উপন্যাসের শেষেও দেখি গোরা আনন্দময়ীর ভারতবর্ষকে চিনতে পারে, ততদিনে তার খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার অন্তর্হিত হয়েছে। অন্যায়কারী ব্রাহ্মণের বাড়িতে জলপান করতে যাবার পথে বাঁক নিয়ে গোরা ফিরে এল সেই নাপিতের বাড়িতেই,যারা স্বামী স্ত্রী বিপন্ন মুসলমান বালক তমিজকে আশ্রয় দিয়েছে, পালন করেছে সন্তানস্নেহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় মাছের যে কত প্রসঙ্গ যে এনেছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর উপন্যাসে, ছড়ায়, কবিতায়, ছবিতে আর চিঠিপত্রে মাছের প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁর কবিতায় 'দামোদর শেঠ কি'র সঙ্গে 'ভেটকি'কে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। 'চিতল' মাছকে বলেছেন, মিঠাই গজার ছোট ভাই। 'নৌকাডুবি'তে খেতে বসে মাছের মুড়ো দেখে রমেশ কালিদাস আউড়ে বলে, 'স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়, এ যে রুই মাছের মুড়ো বলে রোহিত মেস্যর উত্তমাঙ্গ।' অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ এখানে স্বয়ং রমেশের জবানীতে তাঁর আপন বাঙালী হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করেছেন। এসব থেকেই বোঝা যায়, ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হলেও মাছ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনোরূপ সংস্কার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নজরুলের কবিতাতেও দেখি খাদ্য-খাদাদির উপমায় সেই জাতের বালাই দূর করার চেষ্টা। কবি বলেনঃ 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া,/ছুঁলে তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।/হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,/তাইতো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ'-খান।' নজরুলের অন্যান্য অনেক কবিতাতেই এই সাম্প্রদায়িক বাছবিচার দূরীকরণের প্রচেষ্টা আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসের শুরুতেই আছে সাত

গাঁয়ের পুকুরের মাছ ধরার এক বিশাল বর্ণনা। রাজার গুরু লুইপাদ মাছের তেল, পেটি খেতে পছন্দ করেন। তাই ঘটা করে জাল ফেলে শয়ে শয়ে মাছ ধরিয়ে ভাজা, চচ্চড়ি, ছেচকা, বড়ি— এসব রাঁধালেন। গুরু লুইপাদ খেয়ে-দেয়ে শিষ্যকে আশীর্বাদ করলেন, 'তোমার ধর্মে মতি হোক।' রাজগুরু হলেও লুইপাদের মৎস ভোজনে কোনো সংস্কার ছিল না, বরং এ হেন আয়োজনে তিনি সাতিশয় প্রীতই হয়েছিলেন।

বর্ণপ্রথা বা বর্ণবৈষম্য আজও হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অধ্যায়। হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে এই বিষবাষ্পে দগ্ধ হচ্ছে হিন্দু সমাজ। বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দু তথা ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথা এখনও প্রবল। তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এখনও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ঘৃণার চোখে দেখে। তবে প্রাচীনকালে উচ্চবর্ণের মধ্যেও নানাতর প্রভেদ ছিল। মনুস্মৃতি ৩।১০৯-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে যেব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য স্বীয় কুল গোত্রের পরিচয় প্রদান করা যাবে না। কুল লা হয়। অতএব মনুস্মৃতি অনুসারেব 'উদগীর্ণভোজী' ও গোত্রের পরিচয় প্রদান করে ভোজন করলে তাকে ,যে ব্রাহ্মণ বা উচ্চ জাতি নিজ গোত্র ও বংশের পরিচয় দিয়ে নিজেকে উচ্চবর্গীয় বলে প্রতিষ্ঠার দাবী অথবা প্রত্যাশা করেন তিনি অবশ্যই তিরস্কার যোগ্য। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জাতের বিড়ম্বনা' গ্রন্থে বলেছেনঃ "স্মৃতিশাস্ত্রকে এখন রান্নাঘরের হাঁড়িকুঁড়ির শাস্ত্র বলিলেই চলে। রন্ধনটা যে ব্রাহ্মণের একটা বিশেষ কার্য্য একথা সেকালের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের একালের পণ্ডিত মহাশয়েরা সে ভুলটা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। এখন 'বামুন ঠাকুর' অর্থে রাঁধুনি। আজকাল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতের ভাত খাইলে আমাদের ঠাকুর মহাশয়দের এক তাল গোবর খাইয়া সে ভাত হজম করিতে হয়। কিন্তু সেকালে ব্রাহ্মণদের এতটা অজীর্ণ হয় নাই। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের অন্নের তো কথাই নাই; অনেক শূদ্রের হাতের ভাতও তাঁহারা নির্ব্বিবাদে হজম করিতেন। তাঁহাদের জাতটি যে তাহাতে মারা যাইত, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আজকাল আহার বিষয়ে যিনি যত বড়ো 'ছুৎমার্গী', তিনি তত বড়ো পণ্ডিত।" অন্যদিকে বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী, শূদ্রগণ অস্পৃশ্য। মৎসশিকারী ধীবর ও কৈবর্ত্যের স্পর্শ করা জল অস্পৃশ্য। শুঁড়ির হাতের মদ্য পান করলে জাত যায় না অথচ জল পান করলে জাত যায়। ভারতীয় ইতিহাসেও দেখা যায়, হাড়ি বা মেথর শুয়োর ভক্ষণ করলেও তারা অস্পৃশ্য, কিন্তু হিন্দু রাজপুতেরা অনেক ক্ষেত্রে শূয়োর ভক্ষণ করেও উচ্চশ্রেণির হিন্দু। শূদ্রের হাতের জল অচল কিন্তু রাজণ্যবর্গের সোমরস প্রস্তুতির জন্য শূদ্রগণই ছিল একমাত্র অবলম্বন। সোমরস প্রস্তুতির বিনিময়ে প্রাচীনকালে শুদ্রগণকে একটি বাছুরও দেওয়া হত; কিন্তু সোমরস প্রদানপূর্বক ঐ শূদ্রদল কিছুদূর যাওয়ার পর পথিমধ্যে চপেটাঘাত সহ প্রদত্ত বাছুরটি কেড়েও নেওয়া হত। কিন্তু আজও তর্পণ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষে ব্রাহ্মণদের ফল, পান, সুপারি, গামছা, চাল ও ধূপ দেওয়া হয়। কখনও ত পরে কেড়ে নেওয়া হয় না। কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধাদি শেষে অঢেল পান-ভোজনও করানো হয়। পাখির বেশে পূর্বপুরুষ এবং ব্রাহ্মণেরা ভোজন করলে তবেই কৃতার্থ ব্যক্তির পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অন্ন-জল গ্রহণ করতে পারবেন এমন ধারণা আজও সমাজ-মানসে ব্যপ্ত, অথচ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুবাড়ীতে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের (যাদের মূলত দিনভিত্তিক কাজ বা জন খাটার জন্য নিয়োগ করা হয়) খাওয়া দাওয়ার জন্য আজও থালা-বাটি আলাদা করে রাখা হয়। তাদের জলও দেওয়া হয় আলাদা গ্লাসে এবং খাওয়া শেষে তাদেরকেই তাদের ব্যবহৃত থালা বাসন ধুয়ে দিয়ে যেতে বলা হয়। ১৯১৯ সালে পাশ হয় গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট। সেখানে বাংলার আইন সভার জন্য একজন দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি রাখার বিধান করা হয়। একসময় নমঃশুদ্র শ্রেণির মানুষের মধ্যে এই 'দলিত' বা 'বহুজন' শব্দকেই সচেতন ভাবে ব্যবহার ও বিস্তৃত করেছিলেন দলিত-গুরু গুরুচাঁদ। তাঁর একটি কবিতাতেও গুরুচাঁদ বলেছেনঃ

নমঃশুদ্রকূলে জন্ম হয়েছে আমার।
তবু বলি আমি নহি নমোর একার।।
দলিত পীড়িত যারা দুঃখে কাটে কাল।
ছুঁসনে ছুঁসনে বলে যত জলচল।।
শিক্ষা হারা দীক্ষা হারা ঘরে নাহি ধন।

এইসব জানি আমি আপনার জন।। (গুরুচাঁদ চরিত, ১৪৪)

এ থেকেই বোঝা যায় নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতি এই অচ্ছুৎ অভিব্যক্তি কাটাতে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ কতটা সমর্পিতপ্রাণ ছিলেন। আসলে অস্পৃশ্যতার অজুহাতে যে প্রকার ঘৃণা উচ্চবর্ণেরা করে থাকে তা লৌকিক বিধিতে কোথাও পাওয়া যায় না। তার কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিও নেই। যা আছে তা হল অহংকারপ্রসূত এক দেশাচারমাত্র। শাস্ত্রের ঊর্ধে অবস্থিত যে মানবিকতা তা অনিবার্যভাবেই এখনও অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় না।

এ বিষয়ে আরো কিছুটা সাহিত্যালোচনা প্রাসঙ্গিক। হিন্দুধর্মের ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কার অথবা বাতিক নিয়ে শরৎচন্দ্রের লেখা একাধিক উপন্যাস ও গল্প আছে। এখানে তেমনই দু-একটির উল্লেখ করা যায়। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের একস্থানে লেখক শরৎচন্দ্রের ভাষায়ঃ "তিনিও আজ বাটী ছিলেন না। আসিয়াই একজনের নিকটে মোক্ষদা ও বিধুর বিবরণ, এবং সেই সঙ্গে আর যাহা কিছু সমস্তটুকু শুনিয়া ক্রোধভরে উপরে উঠিতেছিলেন, হঠাৎ সম্মুখেই রাশীকৃত **এঁটোকাঁটা** দেখিয়া স্থির হইয়া দাড়াইলেন। সম্প্রতি প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া আসিয়া তাহার বাচ—বিচারের অন্ত ছিল না।" এর আর এক স্পষ্ট উল্লেখ আছে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণকূলের নির্লজ্জতা, ইতরসুলভ গালিগালাজ ও কোন্দলের কথা সকলেরই জানা। এই প্রসঙ্গেই লেখক যখন বলেনঃ "গোবিন্দ আগুন হইয়া কহিল, ঘরে যাও না ভট্চায। যে জন্যে ছুটে এসেছিলে—গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে, আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেও, আজ আর হবে না। এখন যাও আমাদের ঢের কাজ আছে।" ("পল্লীসমাজ", শরৎচন্দ্র) তখন উচ্চবর্গের মানুষের লোলুপতা ও পেটুকে স্বভাব রমেশের মতো আমাদেরও লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়ে দেয়। আবার ঐ একই উপন্যাসে গরীব দীনু সম্পর্কে লেখক বলেনঃ "দীনু রমেশের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, না বাবা, গোবিন্দ সত্যকথাই বলেচে। আমি বড় গরীব, সে কথা সবাই জানে। ওঁদের মত আমার জমি-জমা-চাষ-বাস কিছুই নেই। একরকম চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে-সিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে। ভাল জিনিস ছেলে-পিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেননি—তাই বড় ঘরে কাজকর্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিন্তু মনে ক'রো না বাবা, তারিণীদাদা বেঁচে থাকতে তিনি আমাদের খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। তাই, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বাবা, আমরা যে আশ মিটিয়ে খেয়ে গেলুম, তিনি ওপর থেকে দেখে খুশিই হয়েচেন।" এখানে সরলমনা দীনুর বাসনাকে জাত-পাত অথবা লোভ কোনো কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। মনুষ্যত্বই সেখানে বড় কথা। আধুনিক কালের লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে যেমন বাংলার আঞ্চলিক ও লোকায়ত জীবন ফুটে উঠেছে তেমনই সেই জীবনকে ঘিরে প্রতিফলিত হয়েছে নানা বিশ্বাস, প্রথা ও সংস্কার। তাঁর লেখা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে বনোয়ারী মাইতো ঘোষেদের এঁটোকাটা, উচ্ছিষ্ট খাওয়াকে উচ্চবর্গের মানুষের গড়ে দেওয়া ধর্মীয় বিধান বলে মেনে নিলেও করালী স্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতীক কর্তাবাবার বাহন অজগর সাপকে করালীর পুড়িয়ে মারার মধ্যে দিয়েও সেই অনার্য কৌম সভ্যতার প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন ও শ্রদ্ধাকেই যুগের দাবী হিসেবে সোচ্চার করে তুলেছেন তারাশংকর। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু জীবনে পূর্ববাংলা থেকে এপার বাংলায় ঠাঁই নেওয়া মানুষদের বস্তীতে, লঙ্গরখানায় খাওয়া-দাওয়া ও আত্মীয়তা করতে হয়েছে ধনী-নির্ধন সহ সকল জাতের সাথেই। দুর্দিনে সেখানে এক মানুষের সাথে আর এক মানুষের কোনো ধর্মীয় অথবা সামাজিক তফাৎ ছিল না। উপরন্তু তা ছিল এক মিশ্র সংস্কৃতি। ময়মনসিংহে এক যুগ আগেও গৃহস্থের বাড়ির আঙিনায় দেখা মিলতো বকফুল গাছের। ভোজন রসিক বাঙালির প্রতিটি ঘরে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের মাঝে খাবারে বিশেষ মাত্রা যোগ করতো বকফুলের বড়া বা ভাজা বকফুল। দেশভাগের একাধিক গল্পেও এসেছে এই বকফুলের কথা। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের শেষে দেখি মুসলিম লিগের ডাকা ডিরেক্ট অ্যাকশানের দরুণ অমিতা আর শামিম প্যারাগনে মিলতে পারে না আর তাহের তার ব্রাহ্মণ বন্ধুকে গোমাংস খাওয়ানোয় তাহেরের দাদি তাহেরকে খড়মপেটা করে। দেশভাগ ও দাঙ্গা সম্পর্কিত আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা'। এ উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক বাস্তবভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া ও পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী মানুষদের

অমানুষিক কষ্ট। দেশভাগের পর ওপার বাংলার বাঙালেরা এপার বাংলার ঘটিদের কাছে কীভাবে তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছিল তাও নিপুণ ভাবে ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ও চমৎকার অসাম্প্রদায়িক এক দিক তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক ও সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর ভাষায় উদ্বাস্তু জীবনের বর্ণনাটি এমনঃ "স্টিমারে-ট্রেনে একসঙ্গে যেতে যেতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পিণ্ড পাকিয়ে থাকতে থাকতে, ক্যাম্পজীবনের সর্বজনীনতায় ভেঙে গেল খাদ্যাভ্যাসের, ছোঁয়াছুঁয়ির, জাত-পাতের অনেক সংস্কার। কলোনিগুলিতে ছত্রিশ জাতের একত্র বসবাসে, ওঠায়-বসায়, সংগঠনে-সংগ্রামে ভেঙে যেতে লাগল ভেদ আর সংস্কারের বেড়াজাল।" অদ্ভুত হলেও একে এক ধ্রুব সত্য বলেই আমাদের মেনে নিতে হয়।

সত্যজিৎ-পিতা সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' গ্রন্থটির প্রচ্ছদ প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচ্য বিষয়টিতে ইতি টানা যেতে পারে। সুকুমার রায়ের লেখা ও সত্যজিৎ রায়ের আঁকা এ গ্রন্থের গোটা প্রচ্ছদ জুড়েই পংক্তি ভোজনরত মানুষদের দেখানো হয়েছে। সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে এখনও মাটিতে বসে এমন পাত পেড়ে ভোজনের দৃশ্য দেখা যায়। এখানে সেকালের তেমনই একটি দৃশ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ভোজনরত অভ্যাগতদের প্রত্যেকের ভোজনকালীন আদব-কায়দা অথবা Attitude এখানে আলাদা আলাদা। কারো সাথেই যেন কারো মিল নেই। প্রথম সারিতে বসে একজন খাইয়ে পরিবেশনকারীকে যেন ডাকছে আর বলছে- 'এই এদিকে এসো'। অর্থাৎ সে আরো মন্ডা-মেঠাই (খাদ্য বস্তু) নেবে। ঐ সারিতেই অন্য দুজন ভোজনরত ব্যক্তি যেন পরিবেশনকারীকে বলছেন- 'থাক্ থাক্ আর দিও না'। আবার দ্বিতীয় সারির চিত্রে পাশাপাশি বসা দুজন ভোজনকারী একে-অপরের প্রতি উদ্দেশ্য করে পরিবেশনকারীকে যেন বলছেন- 'আহা ওকে দাও অথবা না...না...একে দাও'। তৃতীয় সারির পাশাপাশি দুজনের উঠি..উঠি করেও যেন মন আর উঠছে না। এর মধ্যে ছোট জন বড় জনকে ওঠার জন্য খোঁচাচ্ছে, কারণ তার পেট আঁইঢাই। চতুর্থ সারির চিত্রে পাশাপাশি দুজন খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, অন্যান্যরা খাওয়ায় ব্যস্ত। এ সারিতে টিকিধারী ব্রাহ্মণদের সেবায় ব্যস্ত একজন পরিবেশনকারী হাঁটু মুড়ে বসে আরো বেশী দিতে চাইছে ও পরিতৃপ্ত ভোজনকারীরা- 'থাক্ থাক্' বলেই চলেছে। পঞ্চম সারির (সম্ভবতঃ শেষ সারি) চিত্রে রয়েছেন গৃহকর্তা স্বয়ং। তিনি সকলকে জোড়হস্তে আপ্যায়ণ করে চলেছেন আর ভোজনকারীদের দল তাঁর আপ্যায়ণের প্রশংসা করছে। প্রতিটি অনুষ্ঠান বাড়িতেই থাকে কিছু নিন্দুকের দল। এখানেও এই কুচুটে নিন্দুকদের মধ্যে দুজন রয়েছে ঐ সারির একেবারে শেষে। সব মিলিয়ে প্রচ্ছদের গোটাটা জুড়ে পাঁচটা সারিতে খাই-খাই এর এই মহাড়ম্বরের আয়োজন সাংঘাতিক বৈ কি! তবে এই প্রচ্ছদে একটা জিনিস লক্ষণীয়। তা হলো, এখানে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে নানা জাতির লোকেরা একসাথে পংক্তিভোজনে রত। তাদের মধ্যে কোনো ছোঁয়াছুঁয়ি অথবা জাতের বালাই নেই। এ যেন এক অসাম্প্রদায়িক সম্মীলন। এখন নানা জায়গায় পিঠে-পুলি উৎসব, মৎস উৎসব থেকে শুরু করে নানা ধরণের খাদ্যমেলা বা মিলোনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোর মাধ্যমেও জাতের বালাই প্রায় পুরোপুরি মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে মানব সম্প্রীতির আবহই উন্মোচিত হয়ে উঠছে।

তথ্যসূত্র :

১. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
২. বৌদ্ধ দর্শন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন
৩. অলৌকিক নয় লৌকিক (তৃতীয় খণ্ড), প্রবীর ঘোষ
৪. মুসলিম সমাজ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা, মইনুল হাসান
৫. বাংলার সমাজে ইসলাম সুচনাপর্ব, অতীশ দাশগুপ্ত
৬. ব্রাহ্মণ্যবাদ, রণজিৎ কুমার সিকদার
৭. আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন, কঙ্কর সিংহ

৮. মনুসংহিতা, সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৯. ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ, লাডলীমোহন রায়চৌধুরী
১০. অনীক, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০০৫
১১. মানবাধিকার ও দলিত, দেবী চ্যাটার্জী
১২. শূদ্র জাগরণ, গৌতম রায়
১৩. বর্তমান ভারত, স্বামী বিবেকানন্দ
১৪. প্রাচীন ভারতে শূদ্র, রামশরণ শর্মা
১৫. জাতের বিড়ম্বনা, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. বাঙালির খাদ্যকোষ, মিলন দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬
১৭. রাজা রামমোহন রায়: জীবন ও সংগ্রাম, সুব্রত শুভ, ২০১৬
১৮. সেই ট্রাডিশন সমানে চলিতেছে, বিশ্বজিৎ রায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪.০৯.২০১৬
১৯. রবীন্দ্র রচনাবলী,চতুর্বিংশ খণ্ড,বিশ্বভারতী
২০.তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ (১৩১৮),সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ,বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ
২১. ছিন্নপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,বিশ্বভারতী
২২. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১ম খণ্ড), এম.এ.রহিম, আসাদুজ্জামান অনুদিত,বাংলা একাডেমি, ১৯৮২
২৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সম্পা: বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১৯০৪, প্রথম সংশোধিত
নিউ এজ সংস্করণ ২০০৩
২৪. D.N. Jha, the Myth of the Holy Cow, Verso, London, 2002
২৫. Debiprasad Chattopadhyay, Science and Society in Ancient India, B R Grüner B V, Amsterdam, 1978.